কবি-কথা

লীলা মজুমদার

সাহিত্য অকাদেমী
নিউ দিল্লী

Kavi Katha (A biographical sketch of Rabindranath Tagore for young readers) by Lila Majumdar. Sahitya Akademi, New Delhi. Second impression, 1962.

রবীন্দ্র-প্রতিকৃতি

শ্রীশম্ভু সাহার সৌজন্যে

প্রকাশক : সাহিত্য অকাদেমী, নিউ দিল্লী

মুদ্রক : শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড

৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯

কলকাতার উত্তরদিকে পুরোনো একটি রাস্তা, তাতে ভিড় কত! ট্রাম, বাস্, মোটর, মোষগাড়ি, ঠেলাগাড়ি আর অগুন্তি মানুষ। দুধারের বাড়িগুলোও গায়ে গায়ে ঠেসে রয়েছে, কোথাও একফালি ফাঁকা জায়গা চোখে পড়ে না। ঐ রাস্তা থেকে বেরিয়েছে ছোট একটি গলি, তার ফুটপাথ নেই। গুটিকতক বাড়ি, একটি ছোট্ট শিবমন্দির, আরো গোটা দুই বাড়ি, তার পরেই মস্ত একটা ফটকের সামনে পেঁছে গলিটা গেছে শেষ হয়ে।

ফটকের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে বিরাট একটি তিনতলা বাড়ি, তার ঝিলমিলি লাগানো সারি সারি জানলা আর লম্বা বারান্দা নিয়ে। নব্বই বিরানব্বই বছর আগে কোনো কোনো বর্ষার দিনে, ওখানে একটি ছিপছিপে পাতলা সুন্দর ছেলেকে গলির দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে থাকতে দেখা যেত। মনে তার বড় আশা আজ হয়তো জলের জন্য মাস্টারমশাই না ও আসতে পারেন। মাস্টারমশাই কিন্তু সময়টি হলেই, ছাতা মাথায় গলির মুখে দেখা দিতেন। কামাই করার নামটি নেই। ঐ ছেলেটির নাম ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জন্ম তার ২৫শে বৈশাখ, ১২৬৮ সালে, গলিটা দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি, পুরানো রাস্তাটি চিৎপুরের বড় রাস্তা।

দশ বিঘে জমি জুড়ে, ঠাকুর-পরিবারের বিশাল বাড়ি, তার বৈঠকখানা, তোশাখানা, অন্দরমহল, আখড়াবাড়ি, সেরেস্তা, আস্তাবল, উঠোন, পুকুর, আমিন, আমলা, কোচোয়ান, দারোয়ান, পণ্ডিতমশাই, কেরানীবাবু, চাকর দাসী, অতিথি-আগন্তুক নিয়ে গমগম করত।

এত বড় বাড়ি যে তার আগাগোড়া চোখে দেখে, ছোট ছেলেটির এমন সাধ্য ছিল না। এখানে একটু উঠোন, ওখানে একটা ঘুপসি ঘর, তার পাশ দিয়ে ঘোরানো সিঁড়ি কোন অজানা জায়গায় উঠে গেছে,

তার একধারে হয়তো একটা বিরাট হল-ঘর সাজসজ্জায় ঝলমল করছে। কোথাও গানবাজনা চলছে, কোথাও অভিনয়ের মহড়া, কোথাও বিশিষ্ট অতিথিদের সঙ্গে আলোচনা গভীর রাত অবধি চলতে থাকে।

তারি মাঝে সেই ছোট ছেলেটিও একটু একটু করে বড় হতে থাকে। তার বড় তেরোজন দাদা দিদি, ছোট একটি ভাইও হয়েছিল, তবে সে বাঁচেনি।

সমাজের ওঁরা একরকম মাথা ছিলেন, জাতে পিরালী ব্রাহ্মণ হলেও শিক্ষাদীক্ষায় সবার আগে। রবীন্দ্রনাথের ঠাকুরদাদাকে সবাই প্রিন্‌স্‌ দ্বারকানাথ ঠাকুর বলত; ধনে মানে তিনি শুধু এদেশে নয়, বিলেতেও সম্মানিত হয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের বাবা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে আধুনিক বাংলার শিক্ষা-দীক্ষার গুরু বলা যেতে পারে, রাজা রামমোহন রায়ের অন্তরঙ্গ। যে ক'জন মনীষী বাঙালী তখনকার হিন্দুসমাজের প্রাচীন সংকীর্ণতা ত্যাগ করে, আধুনিক শিক্ষার আলোয় উদ্ভাসিত সুন্দর সুরুচিসম্পন্ন একটা জীবনযাত্রার পরিকল্পনা করেছিলেন, দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁদের অগ্রণী। গোটা ভারতবর্ষ তাঁর কাছে ঋণী।

রবীন্দ্রনাথের ভাইবোনরাও কম গুণী ছিলেন না। দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথ, প্রথম ভারতীয় সিভিলিয়ান সত্যেন্দ্রনাথ, সুসাহিত্যিক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, বিদুষী স্বর্ণকুমারী দেবী ইত্যাদির নাম বাংলা দেশে কে না জানে? তাঁদের সন্তানরাও অনেকে গুণী ছিলেন। শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথও তাঁদের নিকট আত্মীয়। প্রতিভা ওঁদের ঘরে বাঁধা ছিল।

এককালে ওঁদের অবস্থাও খুবই ভালো ছিল। মস্ত বড় জমিদারির মালিক ওঁরা। দ্বারকানাথের ঠাকুরদাদা নীলমণি ঠাকুরই প্রথমে জোড়াসাঁকোতে বাড়ি পত্তন করেন। তার পরে অবস্থা অনেক পড়ে গেলেও, যা বাকি ছিল তাও কিছু নগণ্য নয়। তবু ওঁদের বাড়ির অন্যান্য ছেলেদের মতো, রবীন্দ্রনাথের ছোটবেলাটিও খুবই

সাদাসিধা ভাবে কেটেছিল। গায়ে থাকত সুতির জামা, পায়ে সাধারণ চটি। খাওয়াদাওয়ার মধ্যেও বিলাসিতার বালাই ছিল না।

ও বাড়ির ছোট ছেলেদের ঘিরে থাকত ভারি একটা শৌখিনতার আবহাওয়া যার মধ্যে বড়রা অবাধে বিচরণ করতেন, কিন্তু ছোটদের ছিল প্রবেশ নিষেধ। মাঝে মাঝে সেখানকার দুটো গানের কলি আচমকা বাতাসে ভেসে এদের কানে ঢুকে আনন্দে এদের আত্মহারা করে দিত। সংযম শিক্ষার এ ছিল বড ভালো ব্যবস্থা।

একটু বড় না হতেই, সেকালকার ধনী পরিবারের দস্তুরমতো, ছোট্ট রবীন্দ্রনাথকেও মেয়েদের তদারকি থেকে বের করে এনে, বার-বাড়িতে চাকরদের জিম্মা করে দেওয়া হয়েছিল। নাওয়াখাওয়ার ভারও তাদের হাতে রইল বাতে শুধু শোবার জন্য মার কাছে যাওয়া, আর বুড়িদের কাছে রূপকথা শোনা। ঐ চাকরদের হাতে রবীন্দ্রনাথকে কতই না কষ্ট সইতে হত, পরে সে সব কথা লিখেছিলেন।

চাকররা কোনো উপায়ে ছেলেদের ঘরের মধ্যে আটকে রেখে, নিজেরা আড্ডা দিতে ব্যস্ত থাকত। ওদের খাবারেও ভাগ বসাত। কত সময় বন্ধ ঘরের জানলা দিয়ে বাইরে পুকুরপাড়ের বুড়ো বটগাছ আর পাড়ার লোকের স্নান করা দেখে, তার সময় কেটেছে। সে সব কথাও গদ্যে পদ্যে ফুটে উঠেছে।

সঙ্গী ছিল দুজন, এক বছরের বড়দাদা সোমেন্দ্রনাথ আর ভাগ্নে সত্য, সেও বয়সে একটু বড়। তারা যেই স্কুলে ভর্তি হল, রবিও বায়না ধরল সেও যাবে স্কুলে। বাড়ির মাস্টারমশাই এক চড় মেরে বললেন, এখন যাবার জন্য যত না কান্নাকাটি পরে স্কুল ছাড়ার জন্য আরো বেশী কান্নাকাটি হবে। হয়েছিলও তাই।

সৌন্দর্যহীন বন্ধ ঘরের ধরাবাঁধা পড়াশুনো কোনোদিনই তাঁর সহ্য হয়নি। গোটাতিনেক ইংরেজি বাংলা স্কুলে চেষ্টা করে, বিদ্যালয়ের পড়ায় সত্যিসত্যি ইস্তফা দিতে হয়েছিল। তখন বাড়ির লোকে বললে, এ ছেলেটার কিছু হবে না।

কিন্তু স্কুল ভালো লাগত না বলে যে পড়াশুনো ভালো লাগত না তা নয়। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি বিদ্যাশিক্ষা চলত ; কুস্তি, বাংলা, সংস্কৃত. ইতিহাস, ভূগোল. বিজ্ঞান, শরীরতত্ত্ব, গানবাজনা. ছবি আঁকা, পরে ইংরেজি সাহিত্যও। অদ্ভুত মাথা ছিল, যা শেখানো যেত সব তখনি শিখে নিতেন, শুধু স্কুল যাওয়াটারই অভ্যাস হল না।

সাড়ে এগারো বছর বয়সে পৈতে হল। তারপর নেড়ামাথায় অনিচ্ছাসত্ত্বেও টুপি চাপিয়ে, বাপের সঙ্গে, পাহাড়ে ক' মাস কাটিয়ে এলেন। তারি মধ্যে শাস্ত্র শিক্ষা. দায়িত্ব শিক্ষা চলত।

যখন ফিরে এসে সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে ভর্তি হলেন, সবাই দেখল রবির সে ছেলেমানুষী ভাবটা অনেক কমে গেছে। যদিও স্কুলে যেতে সমান আপত্তি। এই সময় ওঁর রচনা প্রথম প্রকাশিত হল, 'অভিলাষ' নামে একটি কবিতা! তাতে রচয়িতার নাম ছিল না।

পরের বছর রবীন্দ্রনাথের মা মারা গেলেন। তবে বাবা ছিলেন, স্নেহময় দাদা, বৌদিদি, দিদিরা ছিলেন। ভালোবাসার অভাব ছিল না। এই সময় থেকে আস্তে আস্তে ফুলের মতো, তাঁর কাব্যপ্রতিভা ফুটতে লাগল।

পনেরো বছর বয়সে, হিন্দুমেলায়, তাঁর নিজের লেখা দেশপ্রেমের কবিতা আবৃত্তি করে সকলকে মুগ্ধ করলেন। 'বনফুল' বলে লম্বা এক কবিতা রচনা করলেন। বৈষ্ণব পদাবলীর অনুকরণে 'ভানু-সিংহের পদাবলী' লিখলেন। সে এত ভালো হল যে প্রথমটা কেউ বিশ্বাস করতে চায়নি যে একজন ষোলো সতেরো বছরের ছেলে এমন লিখতে পারে।

'জ্ঞানাঙ্কুর' নামে একটা পত্রিকায়, নিজেদের বাড়ির পত্রিকা 'ভারতী'তে বহু প্রবন্ধ, সতেজ সমালোচনা, বিতর্ক, কবিতা প্রকাশিত হতে লাগল। ধীরে ধীরে লোকের কাছে তাঁর নাম পরিচিত হয়ে উঠল।

ভালো অভিনেতা বলেও খানিকটা খ্যাতি হল, তবে সে সবই

শখের নাটকে, নিজেদের লেখা নিজেদের মধ্যে অভিনয়ে। জন-সাধারণের কাছে দেখা দিয়েছিলেন অনেক পরে।

মনটা ছিল সংগীতরসে সিক্ত, চর্চাও করেছিলেন দীর্ঘকালই। গলা ছিল মধুর। অতি অল্প বয়স থেকে গান লিখে, তাতে সুর দিয়ে, সুললিত কন্ঠে গেয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করে দিতেন। সারাজীবন ধরে কত না গান লিখেছিলেন, ধর্মসংগীত, প্রকৃতির বন্দনা, দেশ-প্রেমের গান, নানান আনুষ্ঠানিক সংগীত, আজো তাদের তুলনা হয় না। অল্প বয়সে রচিত তাঁর বিখ্যাত ব্রহ্মসংগীত

নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে
রয়েছ নয়নে নয়নে।

শুনে স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে পুরস্কৃত করেছিলেন। তাঁর দেশ-প্রেমের অপূর্ব গান 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে'ও খুবই নবীন বয়সে লেখা। এ সমস্ত গান কি ভাবে, কি ভাষায়, কি সুরে সংগীতের সমাজে এক অভাবনীয় সমৃদ্ধি এনে দিয়েছিল, এখনো যা সকলকে বিস্মিত করে দেয়।

এমনি করে বিশ্বকবির আসন নেবার জন্য রবীন্দ্রনাথ তৈরী হতে লাগলেন। কিন্তু বড়রা কিছুটা হতাশ বোধ করতেন, বলতেন যে এই করে তো আর ছেলে মানুষ হয় না, পাসটাস করে একটা কোনো বড় পদ অলংকৃত করা দরকার। এই আশা নিয়ে সতেরো বছর বয়সের রবীন্দ্রনাথকে তাঁর দাদা সত্যেন্দ্রনাথের পরিবারের কাছে বিলেতে পাঠানো হয়েছিল।

ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন বিলিতী শিক্ষা ও সামাজিক জীবনের মধ্যে। নাচগান, সাহিত্য কিছুই বাদ দিলেন না। গরম গরম চিঠিপত্র লিখতে লাগলেন। কাব্যরচনাও একটু আধটু চলতে লাগল, 'ভগ্নতরী', 'ভগ্ন হৃদয় কাব্য,' 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' ইত্যাদি এ সময়কার রচনা। কিন্তু স্পষ্টই বোঝা গেল যে তাঁর মনোভাব একটা নতুন মোড় নিয়েছে,

সম্ভবতঃ তাঁর গুরুজনদের সেটা তত পছন্দ হল না, কাজেই ১৮৮০ সালেই তাঁকে আবার দেশে ফিরিয়ে আনা হল।

ফিরে এসে 'বাল্মীকিপ্রতিভা' ও 'কালমৃগয়া' দুটি গীতিনাট্য রচনা করেন। নানান প্রবন্ধ ও বিতর্কমূলক আলোচনার মধ্যে তাঁর বিলিতী চিন্তা দিয়ে প্রভাবিত সতেজ মনের পরিচয় পাওয়া যেত, অনেকে তাতে রুষ্টও হতেন। যথার্থ যিনি কবি তিনি বাতাসের প্রতিটি কম্পন সম্বন্ধেও সচেতন থাকেন, চারিপাশের সূক্ষ্মতম চিন্তাটিও তাঁকে এড়িয়ে যায় না।

পরের বছর তাঁকে বিলেত পাঠাবার আবার একটা ব্যর্থ চেষ্টা হয়েছিল। এই সময় তাঁর বিখ্যাত কাব্যমালা 'সন্ধ্যাসংগীত' ও 'প্রভাত-সংগীত' রচনা হয়, তার মধ্যে অবিস্মরণীয় কবিতা 'নির্ঝরের স্বপ্ন-ভঙ্গ' পড়লে বোঝা যায় যে কবি এবার নিজেকে খুঁজে পেয়েছেন। কুড়ি বছর বয়সে ছোটদের জন্য প্রথম কবিতা লেখেন 'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর'। পরে ছোটদের জন্য কতই না কবিতার বই লিখে-ছিলেন। এর পরের কয়েক বছরের মধ্যে ভারতের নানান জায়গায় ঘুরেছিলেন, বাইশ বছর বয়সে মৃণালিনী দেবীর সঙ্গে বিয়ে হল, তারপর আরেকবার বিলেত ঘুরে এলেন। কতকগুলো ভালো ভালো বই লিখলেন, ছোটদের উপন্যাস 'রাজর্ষি', বড় গল্প 'মুকুট' আর রাশি রাশি কবিতা। একটার পর একটা কবিতা আর গল্প যেন তাঁর মনের কমলবনে ফুলের মতো ফুটে উঠত।

আস্তে আস্তে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারায় একটা দৃঢ়তা দেখা যেতে লাগল। শত্রুও অনেক জুটেছিল, তারা নানান পত্রিকায় তাঁর বিরুদ্ধে সমালোচনা লিখত। পুরোনো পন্থা ছেড়ে সহজ সুমিষ্ট বাংলায়, নতুন ভাবের উন্মেষ তাদের সহ্য হত না। কিন্তু কবির চিন্তাধারা ছিল বড় বলিষ্ঠ, কোনো বাধা মানত না, নির্ভয়ে নিজের মতো সে প্রকাশ পেত।

ছোটবেলাকার সেই অযত্নের স্বাধীনতা, ওঁদের বাড়ির সংগীত,

সাহিত্য, নাট্য ও শিল্পকলায় অনুরাগ, ওঁদের শিক্ষাদীক্ষা, দেশপ্রেম ও সামাজিক জীবন সম্বন্ধে প্রগতিশীল মনোভাব, এ সমস্তই রবীন্দ্রনাথের স্বাভাবিক কল্পনাপ্রবণ মনকে পুষ্ট করেছিল। কতকাল পরেও কোন্ ঝির মুখে কোন্ মাঝির মুখে শোনা আশ্চর্য সব ভূতের গল্প, বাঘের গল্প, কুমীরের গল্প মনে পড়ত। এই দিয়েই সাহিত্যের উপকরণ তৈরি হয়, দেশের মজ্জায় মজ্জায় যে সব কাহিনীর ধারা চলে থাকে।

নিজের দেশকে গভীরভাবে, প্রবলভাবে ভালোবাসতেন। দেশী পোষাক, দেশী ভাষা, দেশী শিক্ষাকে বড় শ্রদ্ধা করতেন। বিদেশীকেও প্রাণ দিয়ে অভ্যর্থনা করতেন, কিন্তু কখনো নিজেদের বৈশিষ্ট্যকে ছোট করতে চাইতেন না।

এখন তাঁর পাঁচটি সন্তান, সে দায়িত্বও কম নয়। নিজের স্কুলে যাওয়ার দুঃখের কথা মনে করে তাদের বাড়িতে পড়ার ব্যবস্থা করেছিলেন।

জমিদারির কাজে বাংলাদেশের ও উড়িষ্যার গ্রামাঞ্চলে ঘুরতে হত, পদ্মাতীরে শিলাইদহে কখনো ওঁদের কুঠিবাড়িতে কখনো বা বোটে, কখনো স্ত্রীপুত্রকে সঙ্গে নিয়ে, কখনো বা একা বাস করতেন, শান্তিনিকেতনে মহর্ষির সাধনাশ্রমে যাওয়া-আসা করতেন। এমনি করে দেশের পাড়াগাঁ ও সেখানকার বাসিন্দাদের সঙ্গে সুগভীর পরিচয় হয়েছিল। ক্রমে মনের মধ্যে এই ধারণাও জন্মেছিল যে ছেলেপিলে মানুষ করতে হয়, শহর থেকে দূরে অনাড়ম্বর প্রকৃতির মাঝখানে, সেকালের আশ্রমের আদর্শে।

শেষ পর্যন্ত শান্তিনিকেতনে তাঁর মনের মতো বিদ্যালয় স্থাপনের কাজে লেগে গেলেন। তার জন্য অনেক কষ্টও করতে হল, পুরীর বাড়ি বিক্রী করলেন, মৃণালিনী দেবী তাঁর গহনাগুলি দিয়ে দিলেন। এমনি করে ১৯০১ সালে শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয়ের গোড়াপত্তন হল। সেই বিদ্যালয় এখন বিশাল বিশ্বভারতীতে পরিণত হয়েছে।

তখন কবি নিজে পড়াতেন, তাঁর স্ত্রী গৃহস্থালি দেখতেন, কেউ কেউ থাকতেন গুটি দুই-তিন কোঠাবাড়িতে আর বাদ বাকি মাটির কুটিরে। চারদিকে ঢেউ-খেলানো লাল মাটির জমি, থেকে থেকে তাতে ভাঙন ধরেছে, সে জায়গাগুলিকে খোয়াই বলে, উঁচুনিচু কাঁকুরে মাটি, বর্ষায় তার মধ্যে দিয়ে জলের ধারা বয়ে যায়, কয়েকটা বড় গাছ, মনসা গাছ, খেজুর গাছ।

আস্তে আস্তে কয়েকজন গুণী বন্ধুও জুটলেন, তাঁরাও আদর্শের জন্য সাংসারিক সুখের আশা ছেড়ে এলেন। ছাত্রসংখ্যাও বাড়তে লাগল, নানারকম পড়ার নিয়মের পরীক্ষা চলতে লাগল। কোনোরকমে বিদ্যালয়টি দাঁড়িয়ে গেল।

লোকে বলত যত সব বয়ে-যাওয়া ছেলে ওখানে পড়তে যায়, কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই পরে দেশের মুখ উজ্জ্বলও করেছিল। প্রাচীন আশ্রমের নিয়মে কাজ হত সেখানে, ছেলেরা আর গুরুরা মিলে প্রায় সব কাজই করে নিতেন, তবে জনকতক চাকরও ছিল, নইলে পড়াশুনোর অসুবিধা হবার সম্ভাবনা থাকে। এক সময়ে এই নিয়ে গান্ধীজির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতভেদও হয়েছিল।

ছাত্রদের কাছ থেকে সামান্য বেতন নেওয়া হত, শিক্ষকরাও সামান্য বেতন নিতেন, অতি সাদাসিধা খাওয়া পরা হত, সাদাসিধা কাপড় চোপড় পরে, খালি পায়ে সকলে থাকতেন। কিন্তু আনন্দের খোরাক ছিল প্রচুর। গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ ছিল মধুর, কচি প্রাণের কুঁড়িটি ফুটবার অবকাশ ছিল প্রচুর।

শুধু বই-পড়া বিদ্যা নয়, সেবা করা, বাগান করা, শরীরচর্চা, প্রকৃতির প্রত্যেকটি রূপ উপভোগ করা ছিল ওখানকার শিক্ষার অঙ্গ।

তবে বরাবরই টাকাপয়সার বড় অভাব ছিল। কবি তাঁর প্রায় সব টাকাই দিয়ে দিতেন, বন্ধুরাও কিছু জোগাড় করতেন, যা করে হোক চলে যেত।

আশ্রম প্রতিষ্ঠার পর বছর-দুই না যেতেই মৃণালিনী দেবীর

মৃত্যু হল। ততদিনে দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, কবি মাতৃহারা সন্তানগুলিকে বুকে তুলে নিলেন।

১৯০৩ সাল থেকে ১৯০৭ সালের মধ্যে পর পর মেজ মেয়ে, প্রিয় সহকর্মী, স্নেহময় পিতা ও নিজের প্রাণপ্রিয় কনিষ্ঠ পুত্রকে কবি হারালেন। কিন্তু যাঁদের মধ্যে প্রতিভা থাকে, সাংসারিক ওঠা-পড়াতে তাঁদের ক্ষতি করতে পারে না। পার্থিব দুঃখ তাদের চিত্তে গভীরতা এনে দেয়, লেখনীতে অনুপ্রেরণা জোগায়। এই সময়কার অপূর্ব রচনা থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

সংসারের কর্তব্য কবি পালন করে যেতেন, কিন্তু সংসারে আর জড়ালেন না, দেশপ্রেমে ডুবে গেলেন। স্বদেশীর পাণ্ডা হয়ে দাঁড়ালেন, বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে জাতীয় শিক্ষা নিয়ে আন্দোলনে শুধু যোগ দেননি, নেতৃত্বও করেছিলেন। যা-কিছু দেশকে বড় করে তোলে তাতেই ছিল তাঁর প্রবল উৎসাহ। কিন্তু দলগত রাষ্ট্রনীতি সইতে পারতেন না, কোনো গোঁড়ামি বা সংকীর্ণতাকে কখনো মেনে নিতেন না, তাই সারাজীবন মামুলি রাষ্ট্রনীতি থেকে দূরে থেকে, অক্লান্ত ও প্রকাশ্যভাবে দেশের কাজ করে যেতেন। গ্রামের উন্নতির কথাও এই সময় থেকেই ভাবতে শুরু করেছিলেন। দেশপ্রেম আর কাকে বলে?

সাহিত্যক্ষেত্রে একদিকে যেমন রবীন্দ্রনাথের সুখ্যাতির অন্ত ছিল না, অপর দিকে বিরুদ্ধ সমালোচনার জন্য দুঃখও পেতে হয়েছিল, অনেক সময় বন্ধুদের কাছ থেকেও। কবি এ সবে বড়ই ব্যথিত হতেন। কিন্তু লেখনী কখনো বিরত হত না। 'শারদোৎসব,' 'প্রায়শ্চিত্ত,' 'রাজা,' অচলায়তন,' ডাকঘর' ইত্যাদি নাটক, 'গোরা' উপন্যাস, 'জীবনস্মৃতি' ইত্যাদি এই সময়কার রচনা।

ততদিনে কিছু কিছু রচনার ইংরেজি অনুবাদ বেরিয়েছে। দেশের লোকেও প্রীতি ও শ্রদ্ধা জানাবার জন্য তাঁর পঞ্চাশ বছরের জন্মদিনে উৎসবের আয়োজন করেছিল।

জীবনে বহুবার বিদেশে গিয়েছিলেন কবি, ১৯১২ সালে একবার বিলেত যান, সেবার বহু ইংরেজ সাহিত্যিকদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা হয়েছিল, কবি ইয়েটস্ তাঁদের মধ্যে একজন। ১৯১৩ সালে ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি'র জন্য দুর্লভ নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। সারা পৃথিবীতে তাঁর জয়ধ্বনি শোনা যায়। পুরস্কারে পাওয়া এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকার সবটাই কবি শান্তিনিকেতন আশ্রমের কাজে দান করেছিলেন।

গ্রামের উন্নতির পরিকল্পনা অনেক দিন থেকেই তাঁর মনে ছিল। ক্রমশঃ শান্তিনিকেতনের কাছে সুরুলে তার একটি প্রত্যক্ষ রূপও দেখা গেল। সেখানে বৈজ্ঞানিক নিয়মে ফসল উৎপাদন ইত্যাদির পরীক্ষা আরম্ভ হয়ে গেল।

খুব একটা কর্মব্যস্ততার মধ্যে কবির দিন কাটতে লাগল। নতুন মাসিক পত্রিকা 'সবুজপত্র' নিয়ে মহা উৎসাহিত হয়ে পড়লেন, তার সম্পাদনা নিয়ে চিন্তা, তার জন্য লেখা যেন তাঁকে পেয়ে বসেছিল। এই সময় গান্ধীজির সঙ্গেও পরিচয় হয়েছিল, তাঁর শিষ্যরা এসে কিছুকাল শান্তিনিকেতনে থেকেও গিয়েছিলেন।

১৯১৫ সালে ইংরেজ সরকার রবীন্দ্রনাথকে স্যার উপাধি দিয়ে ভূষিত করেন। এর পরের বছরে একবার জাপান ঘুরে এলেন। তারপর ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগে ইংরেজ রাজপুরুষদের হাতে নির্দোষ দেশবাসীদের হত্যার পর, লজ্জায় ঘৃণায় ম্রিয়মান হয়ে, কবি তাঁর স্যার উপাধি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে পাঠিয়ে ছিলেন অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ, সে একখানি অবিস্মরণীয় লিপি।

সারাজীবনে কবি এগারো বার ভারতবর্ষের বাইরে যাত্রা করে-ছিলেন। প্রায় সমস্ত পৃথিবী ঘুরেছিলেন, ইয়োরোপ আমেরিকা, চীন, জাপান, মালয়, জাভা, পারস্যদেশ, কোনোটাই বাদ পড়েনি। যতই পৃথিবীটাকে দেখেছেন, ততই বুঝেছেন সব দেশের মানুষের মধ্যে

মৈত্রী না থাকলে, ভাবের আদানপ্রদান না হলে, এ জগতে সুখশান্তির আশা নেই।

এই আদর্শ নিয়েই ১৯২১ সালে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানে সমস্ত দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির দূতেরা এসে মিলিত হবে এই ছিল কবির আশা।

১৯৩০ সাল এল, ততদিনে কবিকে পৃথিবীর লোকে চিনতে শিখেছে, আরো দু-তিনবার বিদেশে গেছেন, যেখানে গেছেন সেখানেই সংঘর্ষক্লান্ত অধিবাসীরা তাঁকে শান্তির দূত বলে সাগ্রহে অভ্যর্থনা করেছে।

কানে কাজের মন্ত্র নিয়ে জন্মেছিলেন, জীবনের অবসান পর্যন্ত কাজ করেছিলেন। কে বলবে কবিরা কুঁড়ে হয়? ছোটবেলায় ছবি আঁকার শখ ছিল, প্রায় সত্তর বছর বয়সে আবার সেই সখটা ফিরে এল, রাশি রাশি আশ্চর্য ছবি এঁকে ফেললেন।

যেন অন্তরের কোনো তাগিদে আঁকতেন, এতটুকু তর সইত না। সরঞ্জামের অপেক্ষায় বসে থাকতেন না, কাগজ না পেলে পুরোনো পত্রিকার মলাটে, রঙের বদলে কালিকলম দিয়ে, যা হাতের কাছে পেতেন তারই সাহায্যে আশ্চর্য সব ছবি এঁকে ফেলতেন। সে সব ছবি দেখে সারা পৃথিবীর লোকে বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল। কবির খেয়ালের এমন চিত্র আর কোথাও আছে বলে শোনা যায় না।

বাংলার বিমুগ্ধ অধিবাসীরা কবির সত্তর বছরের জন্মদিন করে-ছিলেন মহা ঘটা করে। সেই উপলক্ষ্যে সভা, অভিনয়, ছবির প্রদর্শনী হয়েছিল। দূর দূর দেশের মনীষীরা তাঁদের শুভকামনা পাঠিয়ে ছিলেন, এসেছিলেনও কেউ কেউ। কিন্তু উৎসবের মধ্যে সংবাদ এল গান্ধীজি, নেতাজি ও অন্যান্য দেশনেতাদের ইংরেজ শাসনকর্তারা গ্রেপ্তার করেছেন। কবি ব্যাকুল হয়ে উঠলেন, আনন্দোৎসব বন্ধ করে দেওয়া হল।

সেটা ছিল ১৯৩১ সাল তখন সারা পৃথিবীতে রবীন্দ্রনাথের

মতো অমন সর্বজনস্বীকৃত মহাপুরুষ গান্ধীজি ছাড়া আর এক জনও ছিলেন না। দেশবিদেশের মনীষী পণ্ডিত সাহিত্যিকরা তাঁকে শ্রদ্ধার্ঘ্য পাঠাতেন। কতজন এসে শান্তিনিকেতনে বাস করে গেছেন, কেউ কেউ কাজও করে গেছেন, কতজনার সঙ্গে কবির গভীর বন্ধুত্ব হয়েছিল। পিয়ার্সন, এণ্ড্রুজ, সিলভ্যাঁ লেভি, এলমহার্স্ট, এঁদের নাম শান্তিনিকেতনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

এ দেশের কত গুণীব নাম শান্তিনিকেতনের নামের সঙ্গে মিশে গেছে। সতীশচন্দ্র রায়, অজিতকুমার চক্রবর্তী, সন্তোষচন্দ্র মজুমদার, ক্ষিতিমোহন সেন, বিধুশেখর শাস্ত্রী, নন্দলাল বসু, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আরো কতজন যাঁদের নাম কেউ মনে কবে না।

১৯৪১ সালে বাইশে শ্রাবণ রাখীপূর্ণিমার দিনে, জোড়াসাঁকোর সেই পুরোনো বাড়িতে, যেখানে বহুকাল আগে একটা পঁচিশে বৈশাখে চোখ মেলে কবি প্রথম পৃথিবীকে দেখেছিলেন, আশী বছর পরে সেখানেই, যে চোখ দুটি দিয়ে বিশ্বের এত রূপ দেখেছিলেন, সেই চোখ বুঁজলেন। সারা দেশের লোক শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ল।

কিন্তু একটা মানুষের জীবনের শুধু ঘটনাগুলি বলে গেলে তার সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় না। রবীন্দ্রনাথ মানুষটি কেমনধারা ছিলেন? দীর্ঘ সুন্দব চেহারা ছিল, বলিষ্ঠ গড়ন, উদ্ভাসিত চোখ, গম্ভীর মধুব কণ্ঠস্বর ছিল। ভারি উজ্জ্বল একটা রসবোধ ছিল, অপূর্ব রসিকতা করতেন, তখন চোখমুখ আলোকিত হয়ে উঠত। আবার তন্ময় হয়ে যখন লিখতেন, যেন অন্য জগতে বাস কবতেন, কাছে যেতে কারো সাহস হত না। মাঝে মাঝে লেখা ছেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেন, অন্যমনস্কভাবে এদিক ওদিক কি যেন খুঁজতেন, তখনি আবাব ঘবে গিয়ে লিখতে বসতেন। লেখা তাঁর কাছে ছেলেখেলা ছিল না, ছিল তাঁর সমগ্র জীবনের ব্রত।

আর শুধু কি লেখা, শুধু কি গান, শুধু কি ছবি আঁকা? বেঁচে

থাকাটাকেই একটা শিল্পকলায় দাঁড় করিয়ে দিতে চাইতেন। দৈনন্দিন জীবনকে সৌন্দর্যের উপাসনার মতো করে দিতে চাইতেন।

যে প্রবল দেশপ্রেম তাঁকে দিয়ে 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি'-র মতো গান লিখিয়েছিল, সেই তাঁকে আমাদের দেশের প্রাচীন সাজ আভরণ, সেকালের সাহিত্য-শিল্প-অনুষ্ঠানাদির পুনরুদ্ধার করতেও অনুপ্রাণিত করেছিল। কিন্তু লোক-দেখানি কোনো কিছু তাঁর কাছে ঠাঁই পেত না। সর্বান্তঃকরণে যা বিশ্বাস করতেন কেবলমাত্র তাই বলতেন, তাই করতেন। বিধাতার মঙ্গল বিধানের উপর নিগূঢ় আস্থা ছিল। তাই এত যে রাশি রাশি লিখেছেন, তার মধ্যে পরস্পরবিরোধী কোনো কথা খুঁজে পাওয়া যায় না। কেবল যাকে সত্য বলে জানতেন তাই লিখতেন। তবে নবীন বয়সে যেটাকে বরেণ্য বলে মনে করেছিলেন, অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে প্রবীণ বয়সের অভিজ্ঞতার ফলে সে বিষয়ে মত বদলে গেছে। এও তাঁর সত্যনিষ্ঠারই পরিচয় দিচ্ছে।

ছোটদের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধটাই ছিল নতুন ধরণের, তাদের তিনি ভারি শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। তাদের বুদ্ধিহীন ছেলেমানুষ বানিয়ে রাখতে চাইতেন না, ওদের জন্য খোকামিতে ভরা রচনা ভালোবাসতেন না, বলতেন ওদের অনেকখানি বুঝবার ক্ষমতা থাকে। ন্যাকামি সইতে পারতেন না, বিশ্বাস করতেন কঠিন জিনিসকে সহজ করে বুঝিয়ে দিলে ওরা তার সবখানিই হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, উঁচু দিকে ওদের চোখ ফিরিয়ে দিলে আপনা থেকেই ওরা বড় হয়ে উঠবে।

মারধোর কটু কথার বদলে যুক্তি দিয়ে ছোটদের বোঝাতে চাইতেন। কুঁড়েমি, ঢিলেমি ভালোবাসতেন না, সারাদিন কাজকর্মে, খেলা-ধূলা-গানবাজনায় কাটবে, এই চাইতেন।

শৌখিনতা পছন্দ করতেন না, নিজেও অনেক সময় অনেক কষ্ট করেছেন; আর যখন বিলাসিতার মধ্যে থাকতে হয়েছে, তখনো কেমন নির্লিপ্তভাবে থেকেছেন।

যা কিছু নকল, যা কৃত্রিম সে সমস্তকে পরিহার করে চলতেন। এই সব কারণেই দেশপ্রেম তাঁর অমন প্রগাঢ় হতে পেরেছিল। বিদেশীদের গুণকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন, কিন্তু তাদের নকল করাকে ঘৃণার চোখে দেখতেন। পুরোনো ধরাবাঁধা নিয়ম ছেড়ে এসে, কিন্তু বিদেশীর অনুকরণ না করেও যে একটা বলিষ্ঠ সংস্কৃতি হতে পারে, যার মূল থাকে প্রাচীন শিক্ষায় আর ডালপালা মেলে থাকে আজকের সূর্যের আলোতে, রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী তারই প্রমাণ।

তাঁর গানগুলি এই কথারই আরেকটি নিদর্শন। তাদের ভাষা আধুনিক, সুর অভিনব, কিন্তু তাদের মধ্যে দিয়ে সেই আমাদের প্রাচীন পিতারাও কথা কয়ে ওঠেন। আর যেমনি সে কথা, তেমনি সুর, এদেশ ছাড়া কোথাও তাদের জন্ম হতে পারত না। যত রকম অবস্থা ও অনুষ্ঠান কল্পনা করা যায়, প্রত্যেকটির যোগ্য রবীন্দ্র-সংগীতও খুঁজে পাওয়া যায়। এমন কোনো দুঃখ হতাশা নেই যার সান্ত্বনা কবির গানে পাওয়া যায় না। আমাদের প্রাচীন সাহিত্য ও সংগীতশাস্ত্র বিষয় সুগভীর জ্ঞান আর তার সঙ্গে অপূর্ব প্রতিভা না থাকলে এমন হওয়া সম্ভব নয়। এত উঁচু দরের এত সংখ্যক কবিতা, গান, নাটক, উপন্যাস, ছোট গল্প, প্রবন্ধ কোনো যুগে পৃথিবীর কোনো একজন মানুষ রচনা করেছেন বলে শোনা যায় না। তার উপর শিক্ষা ও শিল্প নিয়ে এত গভীর চর্চা যে একজন মানুষকে দিয়ে সম্পন্ন হতে পারে, এ কথা সহজে ধারণা হয় না।

কিন্তু এসবের চাইতেও বড় কীর্তি তাঁর এই ছিল যে উপেক্ষিত পরাধীন ভারতবর্ষকে তিনি বিশ্বের চোখে সম্মানিত করতে পেরে-ছিলেন। তাঁর সমস্ত রচনা, সমস্ত কীর্তির মধ্যে এমন একটা উন্নত ভারতীয় ছাপ ছিল যা সমগ্র পৃথিবীর দৃষ্টি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পেরেছিল। ভারতবর্ষের আদর্শ সম্বন্ধে চিন্তার জগৎকে তারা সচেতন করে দিয়েছিল। স্বদেশের চরণে এই ছিল তাঁর নৈবেদ্য।